কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়: বিদ‘আত ও বিভক্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৬. ৬. ৪. খারিজী ফিরকা[1] - ৬. ৬. ৪. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস

৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান (রাঃ) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মু‘আবিয়া (রাঃ) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে রূপান্তারিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এ পর্যায়ে আলীর (রাঃ) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে ‘খারিজী’ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা ‘কুর্রা’ বা ‘কুরআনপাঠকারী দল’ বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ হলো অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ.

‘‘মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।’’[2]

Anchorএখানে সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালানর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে। মু‘আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

‘কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই’ বা ‘‘বিধান শুধু আল্লাহরই।’’[3]

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআন কারীমে আরো এরশাদ

করা হয়েছে,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।”[4]

তারা দাবি করে যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অমান্য করার কারণে আলী, মু‘আবিয়া ও তাঁদের অনুগামিগণ সকলেই কাফির। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[5]

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রাঃ) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।[6]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভান্ডার।[7] এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।[8] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে।[9]

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলীকে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছেন। এছাড়া মু‘আবিয়া (রাঃ) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা

করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[10]

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে ‘পিউরিটান’ ধারণা লালন করত। তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় এবং এইরূপ ‘‘কাফিরদের’’ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠা’ করা এবং পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দীনের সবচেয়ে বড় ফরয।[11]

এদের বিদ্রোহের পরে আলী (রাঃ) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জমায়েত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রাঃ) শাহাদতের পরে তাঁর উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহবা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব![12]

আলীকে (রাঃ) এভাবে হত্যা করাতে আব্দুর রাহমানকে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (মৃত্যু ৮৪ হি) বলেন: ‘‘কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।’’[13]

আলী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরেকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের ‘ব্রান্ডের’ ইসলাম বা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[14]

ফুটনোট

[1] খারিজী ফিরকা বিষয়ক তথ্যাদির জন্য দেখুন: বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০, ৭২-১১৪; শাহরাস্তানী, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল ১/১১৪-১৩৯; আবূ মুহাম্মাদ আল-ইয়ামনী, আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবঈনা ফিরকাহ ১/১৮-৪২; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জালী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ২১-১৪৯; আন-

নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ শাবাব আল-ইসলামী, আল-মাউসূ‘আতুল মুয়্যাস্সারাহ, পৃ. ১৩-২০; ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা; আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখ; মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা।

[2] সূরা হুজুরাত, ৯ আয়াত।

[3] সূরা আনআম, ৫৭ আয়াত, সূরা ইউসূফ, ৪০ ও ৬৭ আয়াত।

[4] সূরা মায়িদা, ৪৪ আয়াত।

[5] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৪৭-৪৮।

[6] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/৩৮০-৪৩০; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৫৯।

[7] বিস্তারিত দেখুন, মুবার্রিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল।

[8] ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলিস, পৃ. ৮৩-৮৪।

[9] আল-আজুর্রী, আশ-শারী‘আহ, পৃ. ৩৭।

[10] ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

[11] আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ ৫/১১০, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

[12] মুবাররিদ, আল-কামিল ৩/১১২০।

[13] মুবাররিদ, আল-কামিল ৩/১০৮৫।

[14] ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস ২/১৪৯।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13803

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন